ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী প্রবক্তৃত

মন তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত সংকলন

প্রকৃতির গ্রন্থ পাঠ কর

সংকলক ঃ

ডাঃ সুধীন্দ্র দাশ নিয়োগী

কালচার এবং

বিশেষ প্রকাশ

॥ প্রথম প্রকাশ ॥

২৩শে কার্তিক, ১৩৯৬

৯ই নভেম্বর, ১৯৮৯

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

পুস্তকের সমালোচনা সম্বলিত সংবাদে উদ্ধৃতি ব্যতীত এই পুস্তকের ভারতীয় প্রকাশক শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী সেণ্টার অব, কালচার এণ্ড এডুকেশন, ৩৪৮ নং গাঙ্গুলী বাগান, কলিকাতা-৭০০০৪৭-এর লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে এই পুস্তক বা ইহার কোনও অংশ যে কোনও ভাষায় যে কোন প্রকারে পুনরায় মুদ্রিত করা যাইবে না।

শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী সেণ্টার অব কালচার এণ্ড এডুকেশন, ৩৪৮, গাঙ্গুলী বাগান, নাকতলা, কলিকাতা-৭০০০৪৭ কর্তৃক প্রকাশিত ও রায়চৌধুরী প্রিণ্টিং এণ্ড বাইণ্ডিং সার্ভিস, ১-এ, হুজুরীমল, কলিকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক শিবশঙ্কর প্রেস, কলিকাতা-৭০০০৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : দুই টাকা

॥ এক ॥

আমাদের মনটা একটা বস্তু বিশেষ। দেহ যেমন একটা বস্তু, তেমনি মনটাও একটা বস্তু। মন কি করে বস্তু হতে পারে সেটা আগে বুঝা দরকার। মনটা যে একটা বস্তু এটা আপাততঃ মনে হয় একটা অসম্ভব কথা। শাস্ত্রে মনকে বস্তু বলে স্বীকার করে না। কিন্তু মন বস্তু বলেই সেই চৈতন্যময় বস্তু দিয়ে সকল বস্তুর বস্তুত্বকে আয়ত্ত করা মনের কাছে কঠিন নয়।

অনন্ত বিশ্বের বিরাট রশ্মি হচ্ছে আমাদের মন। বিশ্বের যেখানে যা কিছু রয়েছে তার সবকিছুর রেশটাই মন। সৃষ্টির যেখানে যেভাবে যে কাজ হচ্ছে, প্রকারান্তরে মনকে নিয়েই নাড়াচাড়া হচ্ছে। মনের বিরাট ক্ষমতার সাহায্যে হাজার হাজার কাজ হচ্ছে, সকল সমস্যার সমাধান হচ্ছে। সংস্কারের চাপে আমাদের মুক্ত চিন্তা করতে অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু তাই বলে মনটা তো আর নষ্ট হচ্ছে না। সত্তাটা ঠিকই থেকে যায়। আমরা যদি কোনভাবে motionটা ঠিক রাখতে পারি, balanee করে চলতে পারি, গতির সাথে গতি মিলিয়ে চলতে পারি, তবেই সকল শক্তি আমাদের আয়ত্তে এসে যাবে। মনই হচ্ছে বস্তুর বস্তুত্ব। সেটাই হচ্ছে সেই আদি সুর যা হতে বিশ্ব জগতের সৃষ্টি হয়েছে। মনই তাই স্রষ্টা বা ভগবান। অগণিত জীবের অগণিত রূপ যে মনন শক্তিরই রূপ। মনই একাধারে ভক্ত ও ভগবান—গীতায়

বর্ণিত অর্জুন ও কৃষ্ণ। মনের শক্তিই হচ্ছে গুরুশক্তি—স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ শক্তি, বিরাটের সেই বিরাট শক্তি। প্রতি মুহূর্তে সজাগের বাঁশী বাজিয়ে মন আমাদের সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছে—সজাগ করে দিচ্ছে। মনই হচ্ছে মন্ত্রশক্তি, মনই হচ্ছে সপ্তচক্র। মনই যার যার আরাধ্য দেবতা মনন আকারে স্রষ্টা সততই সবার মাঝে নির্বিকল্প অবস্থায় গভীর সমাধিতে সমাহিত হয়ে আছেন। মন একধরণের অতি সূক্ষ্ম বস্তু। এত সূক্ষ্ম যে তাকে খুঁজতে গেলে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ অতি সূক্ষ্ম বস্তু হতেই সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, পৃথিবী ও অগণিত গ্রহ নক্ষত্র হতে শুরু করে জীবজগতের যাবতীয় যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে। মনন করার সাথে সাথে মুহূর্তে সব কিছু সৃষ্টি হয়ে যায়। মন হতেই এ জগতের সৃষ্টি। মনটা হচ্ছে এমন সত্তা যা সব সময় প্রদীপের শিখার মত প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় রয়েছে। জ্ঞানও মনেরই একটি ধারা, আবার চৈতন্যও মনেরই একটি ধারা, প্রাণও ঐ মনেরই ধারা। মন একাধারে বুদ্ধি, জ্ঞান ও বিচার। মন এমন একটি ধারাতে রয়েছে যাকে বিশ্লেষণ বা বিচার করা চলে না, যার আখ্যা ব্যাখ্যা নেই। মনকে বুদ্ধি বলা যায় না, জ্ঞানও বলা যায় না, আবার সব কিছুই বলা যায়। এমন একটা অবস্থায় রয়েছে যা চৈতন্য নয়, জ্ঞান নয়, বিচার নয়। আবার সব কিছুর সমন্বয়ই হচ্ছে আমাদের এই বিরাট মন। আকাশের মত মন চিরযুগ ধরে আকার-বিহীন হয়ে শূন্যময়ের অবস্থায় রয়েছে। আকাশের মত মন ধীর, স্থির, অচল অটল হয়ে আছে। এটাই হচ্ছে যোগ বা ধ্যানের অবস্থা, নির্বাণ নির্বিকল্পের অবস্থা। আকাশস্থিত অবস্থায় মন নিজেই আকাশ

হয়ে রয়েছে, আবার এমন একটা রূপের প্রকাশ করছে যার পরিচয় হচ্ছে অনন্ত জীবজগৎ। গলিত পদার্থের ন্যায় মিশে থাকার অবস্থায় শূন্যময় জগতে সর্বত্র বিচরণ করছে। গলিত লোহা যেমন ছাঁচের ভিতরে solid আকারে ভিন্ন আকার (shape) গ্রহণ করে, তেমনি মন হতেই সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ও অগণিত জীব বিভিন্ন আকারে সৃষ্ট হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও নামাকরণ হলেও একই মন হতেই সব কিছুর সৃষ্টি। একই মনের অজস্র ধারা। সবার মনই আবার মহাশূন্যে গিয়ে একই ধারায় মিশছে। মন, আত্মা, দেহের বিভিন্ন নামাকরণ হলেও বস্তু একটাই। এই জগৎটাই হচ্ছে মনের প্রতীক, এই বিশ্বপ্রকৃতিকেই একজাতীয় মন বলা যেতে পারে। এই জগৎটা যা দিয়ে তৈরী তার সকল বিষয়বস্তুই মন থেকে তৈরী। তাই মনই হচ্ছে জগৎ, জগৎটাই মন।

যে বস্তুর দ্বারা মন গড়া তা এত সূক্ষ্ম যে তার কাছে সবই ফাঁকা। মনের কাছে জগৎ বা পৃথিবী খুবই ছোট। মনই সমস্ত পৃথিবীকে একটা কঠিন আকারে আটকিয়ে রেখেছে। মনে আছে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। মনে আছে বুদ্ধিবৃত্তি, আছে দেহের শক্তি। এই জগৎটা হচ্ছে মনের রূপ, আত্মার রূপ। মনের তাই মৃত্যু নেই। রূপান্তরময় এই জগতে সকল বস্তুর মাঝেই চৈতন্য আছে, প্রাণ আছে, মন আছে। প্রাণ, চৈতন্য, আত্মা, মন বা দেহ—সব একই জিনিষের বিভিন্ন রূপ। শুধু বুঝবার সুবিধার জন্য বিভিন্ন নামাকরণ করা হয়েছে। এই পরিবর্তনশীল জগতে যেখানেই পরিবর্তন, সেখানেই

ইচ্ছাশক্তি আছে, তাই মন আছে। এই যে এক বস্তু হতে আর এক বস্তুতে পরিবর্তন হচ্ছে তা থেকেই বুঝতে হবে যে প্রতিবস্তুর প্রতি অণুপরমাণুতেই মন ও ইচ্ছাশক্তি কাজ করছে। এমনি তা বুঝা না গেলেও মন ঠিকই আছে, তা না হলে পরিবর্তন সম্ভব হত না। ঘুমিয়ে যে আছে, সে তো অল্প ডাকে সাড়া দেয় না। তাই বলে কি তার মন নেই? মনের রূপ হচ্ছে বিশ্বরূপ। মনটা হচ্ছে প্রদীপের শিখার মত—আলোর মত। প্রদীপের মাথায় যে আগুনটুকু জ্বলছে তার যে আলো এটাই হচ্ছে মনের রূপ। আগুন জ্বলছে আর সাথে সাথে তেল সলতেকেও তার সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে। মনটাও ঠিক তাই। এর মাঝে আগুনও আছে, তেল সলতেও আছে। সলতেতে যে তেল টানছে সেই তেল পুড়েই আলো হচ্ছে। তেমনি মনটা যখন আলোর মত জ্বলে উঠছে, সেও সলতের তেল টানার মত দেহের রক্তকে টানছে। ফলে রক্ত ক্ষয় হচ্ছে, মনটাও আলোর মত ছড়িয়ে পড়ছে। মহাশূন্যে ব্যপ্তমান হয়ে রয়েছে। তাই মনের কোন রূপ নেই। খুঁজে না পাওয়াই হচ্ছে মনের রূপ। আবার যেখানে যা কিছু দেখছি, সব মনেরই রূপ। মনের এতটুকু বিশ্রাম নেই, চলার এতটুকু বিরাম নেই। চলছে তো চলছেই।

বস্তু হতে যেটা বহির্গত হয় সেটাও বস্তু। তাই ফুল থেকে বহির্গত যে সুবাস সেটাও এক জাতীয় বস্তু। মনটা হচ্ছে দেহের সুবাস, সুবাসের মতই চারদিকে ছড়িয়ে আছে। মনটাও তাই বস্তু বিশেষ। মন বস্তুর আকারে আছে বলেই মন দ্বারা মনন করে যে কোন বস্তুকে চোখের সম্মুখে আনা বা তার বস্তুত্বকে বের করা সম্ভব

হচ্ছে। হাত দিয়ে একটি গাছের ডালকে নত করার মতই মনের ক্ষমতা দিয়ে (will force) কোন গাছকে সহজেই নত করা যায়। মনের ক্ষমতাও এক জাতীয় হাতের কাজই করে। যে বিষয় বস্তুকে চিন্তা বা মনন (ধ্যান) করা হয়, মন তাকে সেই আকারে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে। জল আকারে, বাষ্প আকারে, বায়ুর আকারে অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় যে মন সর্বত্র ব্যাপ্তমান ছিল সেই মনই তখন জমাট বাঁধার চেষ্টা করে। আর সর্বব্যাপ্তমান মন তখন জমাট বেঁধে কঠিন আকার প্রাপ্ত হয়। যে ক্ষমতাটা সহজাতভাবে সুপ্তাকারে সবার অণু-পরমাণুতে বিদ্যমান ছিল, সেটাই তখন বাহ্যিকভাবে কার্যকরী হয়। মন শক্তির সাথে যুক্ত আছে বলেই আমাদের এই দেহ ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠেছে। মন দেহের সকল ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে রেখেছে বলেই দেহ টিকে আছে, তা না হলে মৌচাকের মৌমাছিদের মত দেহটা উড়ে যেত। মন দেহের সকল বিষয় বস্তুকে তার নিজের মত করার চেষ্টা করে। দেহের বিষয়বস্তু যদি মনের সাথে মিশে যায়, তবে সব কিছু করা সম্ভব। মনটা এমন একটা বস্তু যে, মনন করার সাথে সাথেই মন তার একটা ছবি তুলে নেয়—ঠিক যেমন করে ক্যামেরাতে lense-এর সাহায্যে ছবি তোলা হয়। মনন করার সাথে সাথেই ভাবের প্রকাশ ও বিকাশ হয়। সাথে সাথে মন সব কিছু জেনে নেয়, বুঝে নেয়। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মন সমস্ত বস্তুকে অনুভব করে—বুঝে নেয়, জেনে নেয়। সমস্ত বিষয়বস্তু অনুভব করার ক্ষমতা, সকল বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব মনের আগে জানা ছিল বলেই মন সকল বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত হয়ে, সকল অবস্থার সাথে সমতা রক্ষা করে

সবকিছু চালিয়ে নিচ্ছে। যে আদিশক্তির দ্বারা, যে ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে আবহমান কাল হতে একের পর এক সৃষ্টি হয়ে আসছে, তার আদি হচ্ছে মন। মন ও দেহ একই সত্তার সত্তা। দেহ-চেতনা আর মনের চেতনা একই চেতনা হতে উদ্ভূত—একই অবস্থার অবস্থা। দেহবোধ হতেই আসে মনের প্রসারতা, জ্ঞানের প্রসারতা। দেহ আর মন বরফ আর জলের মত একই বস্তুর বস্তুত্ব। দেহটাই মন, আবার মন হতেই দেহ উদ্ভব। জলের মত মনেরও কিছুটা ধারা আছে যাতে করে বাষ্পের আকার নিয়ে মনও মিশে যাওয়ার অবস্থায় মিশে যায়। তাইতো মনের সর্বত্র গতি। মনের কিছুটা আবার রয়েছে দেহের আকারে জমাট বেঁধে। উত্তাপ্রে এই দেহও বরফের মত গলে যায়, মিশে যায়। আমাদের মন বা দেহ শুধু মৃত্যু হলেই মিশে যায় না। মৃত্যুর আগেও মিশে মিশে যায়। ভূমিষ্ঠ হবার আগেও সবাই মিশেই ছিলাম। ভূমিষ্ঠ হবার পরও মিশে মিশেই যাচ্ছি। মিশে যাবার যে ধারা হতে এসেছি, সেই সহজাত ধারা আজও আমাদের মাঝে বিদ্যমান। যে দিন এ দেহ মাতৃগর্ভে ছিল, রক্ত কণিকায় ছিল, খাদ্যে ছিল—জলে, বাতাসে ও আলোতে ছিল, সেদিনও যেমন ছিলাম, আজও ঠিক তেমনি আছি। মিশেই ছিলাম, মিশেই রয়েছি, আবার মিলিয়ে যাবার প্রয়াসেই এগিয়ে চলেছি। জীবন যাত্রার পথে শুধু ভিন্ন ভিন্ন রূপের মাঝে রূপান্তরিত হতে হতে চলেছি। এই যে মিশে যাচ্ছে বলছি, প্রতি অবস্থাতেই তাতে অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব কিন্তু ঠিকই থাকছে। যে শক্তি হতে যেভাবে এসেছি সেই শক্তির চিন্তার ধারাতে গেলে আজও আমরা সেই শক্তি হতে পারি। জীবজগতের প্রতিটি

জীব সকল অবস্থাতেই একই সত্তাতে একই অবস্থায় রয়েছে। সিদ্ধি-মুক্তির জন্য তাই আলাদা করে কাজ করার দরকার হয় না। সকল অবস্থাতেই আমরা সিদ্ধ, মুক্ত ও বুদ্ধ অবস্থাতেই রয়েছি। আমাদের মন শুধু দেহেতেই সীমাবদ্ধ নয়, মন অনন্ত বিশ্বের সর্বত্র ধ্বনির আকারে, চৈতন্যের আকারে বিরাজিত অবস্থায় বিরাজমান। গোটা আকাশকেই তাই মন বলা চলে। মনকে একাধারে আকাশ বলা চলে, ধ্বনি বলা চলে, সুর বলা চলে, বেদ বলা চলে। মন পৃথক কিছু নয়—সবকিছুর সমন্বয়ে আলোকিত। সবাই আমরা একদিন যখন অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় ছিলাম, সারা বিশ্বে তখন আমাদের মন বিরাজ করত। মনের তখন একটা সহজ স্বচ্ছ ভাব ছিল—প্রকৃতির সাথে একটা মিলনের অবস্থা ছিল। মনের সেদিনকার সেই সর্ব ব্যাপ্ত-মানতার অবস্থাটা আজ না থাকলেও তার রেশটা ঠিকই আছে। তাইতো মন সদা সর্বদা এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু দেহ নিয়ে আর ঘুরতে পারছে না। দেহটা আজ জমাট বেঁধে ধীর স্থির হয়ে গেছে। কিন্তু মন যখনই এদিক ওদিকে যায়, সাথে সাথে দেহের কিছু অংশও মনের সাথে সাথে চলে যাচ্ছে। অবশ্য আমরা সেটা বুঝতে পারছি না। চিন্তার সাথে সাথে দেহেরও স্খালন হতে থাকে। এমনি করে প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে দেহ হতে একটা সূক্ষ্ম বস্তু বেরিয়ে যায় বলেই দেহের পরিবর্তন হচ্ছে—লয় ক্ষয় হচ্ছে। তাইতো কিশোর, যৌবন ও বার্ধক্য আসছে। দেহ ক্রমশঃ ক্রমশঃ অনিমা শক্তির সাথে অণু হয়ে মিশে যাচ্ছে এবং দেহের তেজকনিকা ক্রমশঃ ক্রমশঃ বেরিয়ে যাচ্ছে বলেই পরিবর্তিত হতে হতে দেহ বার্ধক্যে উপনীত হচ্ছে। এই যেতিলে

তিলে ধাপে ধাপে আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয়ের কর্মক্ষমতা কমে আসছে এটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে অনিমা শক্তি আজও সম্পূর্ণভাবে আমাদের আয়ত্তে রয়েছে! ফুলের সুগন্ধ যেমন ফুলের, মন তেমনি আমাদের। মনটাও হলো দেহের সুগন্ধ। ফুলের গন্ধ যেমন বেরিয়ে যাচ্ছে, তেমনি দেহ হতেও সুগন্ধরূপ মনটা অনর্গল ফোয়ারার মত মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে! এভাবে যেতে যেতে এই দেহও একদিন মনের আকার নিয়ে মনের সাথে বেরিয়ে যাবে। দেহও তখন মন হয়ে যাবে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মন সব সময় ঘুরে বেড়াচ্ছে—সব সময় আপন মনে নিজস্ব গতিতে চলছে ও কাজ করে যাচ্ছে। মন কারও জন্য অপেক্ষা করে না। উনান হতে সব সময় যেমন তাপ বয়ে চলছে "শিষের" আকারে, মনটাও তেমনি তাপের মত "শিষ" হয়ে উঠে যাচ্ছে—সব সময় বয়ে চলেছে। বাতাস যেমন বয়ে চলেছে, জল যেমন বয়ে চলেছে, মনও সেইরূপ বয়ে চলেছে। মনকে তাই খুঁজে পাওয়া যায় না, মনের তাই কোন সংজ্ঞা নেই।

আমরা যেসব দেশ দেখতে পাচ্ছি, এসব দেশই একদিন নদী বা সমুদ্রের ভিতর চিনির সরবতের ন্যায় ঘোলাটে অবস্থায় ছিল। সেই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলি একত্রিত হয়েই দেশের পর দেশ গড়ে উঠেছে। আমাদের মনও তেমনি বিশ্বসমুদ্রে ঘোলা মাটির মত ভাসমান থেকে আপন মনে নিজস্ব গতিতে ঐ মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল! মন্থনে যেমন দুধ হতে মাখন জমাট বাঁধতে থাকে, সমুদ্রের ঘাতে প্রতিঘাতে যেমন 'ফেনা' হয়, তেমনি মনের একটা বিরাট আলোড়নেই সব form নিতে আরম্ভ করলো। আপন বিরাট গহ্বর পূরণের জন্য এই মহাশূন্য

বিশ্বসমুদ্রে সোঁ সোঁ করে প্রলয়ের গতিতে চলছে। মহাশূন্যের এই গতি সমস্ত বস্তুর ভিতর দিয়েই বয়ে চলেছে। মহাশূন্যের স্রোতের টানে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থের আলোড়নের ফলে এক একটা গ্রহ-নক্ষত্র গড়ে উঠেছে। এমনিভাবেই মহাশূন্যের গহ্বর হতে বিভিন্ন নামাকরণে অভিহিত পদার্থগুলো বের হয়ে আসতে থাকে। হাঁসের ডিমের কুসুমে কি বাচ্চা আছে? অথচ তা থেকেই তো একটা জ্যান্ত হাঁস বেরিয়ে আসে। ঠিক তেমনি করে এই মহাশূন্যের মাঝে মনের মন্থনে মন্থনেই সৃষ্টি হল জীবজন্তু গাছপালা নিয়ে একটা গোলাকার পৃথিবী। এমনি করেই মন্থনে মন্থনে ঘূর্ণনে ঘূর্ণনে সৃষ্টি হয়েছে ভূলোক, ভবলোক, জনলোক প্রভৃতি লোকের পর লোক। মৈথুনে যেভাবে জীবের সৃষ্টি, মনের মন্থনে মন্থনে তেমনি ভাসমান জ্ঞান-অণুগুলো একত্রিত হয়ে গঠিত হচ্ছে এই জগতের রূপ। বিশ্ব-বিরাটের জ্ঞান-অণুগুলো যেভাবে ভাসমান রয়েছে, তাকে একত্রিত করতে হলে মনের বিরাট আলোড়ন চাই। অনন্ত জীবলোকের মনের রেশগুলো যখন একই সত্তায় আলোড়িত হতে থাকে, সেই আলোড়নে যে মন্থন হতে থাকে তাতে মহাশূন্য হতে অনন্ত ভাসমান অণু-পরমাণুগুলি একত্রিত হয়ে পৃথিবী গঠিত হয়। সমস্ত জীবলোকের মন একত্রিত হয়ে গঠিত হয় একটা মন্থনের যন্ত্র। এই মন্থনে যে বিরাট আলোড়ন হয় তাকেই বলে প্রকৃতি-পুরুষের মিলন—শিব-শক্তির মিলন। এই যে বিরাট সঙ্গম তাতেই সৃষ্টি হয় চৈতন্য রূপ মাখন। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে সেই চৈতন্য আমার শ্বাসে প্রশ্বাসে, নানা দিকদৃষ্টির ভিতর দিয়ে নানা বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপভোগ

করছি। সেই বিরাট বস্তুর সাথে একই যুক্ততায় যুক্ত আছি বলেই আমরা তা উপভোগ করছি।

আমাদের মনটা হচ্ছে—এমন একটা চৈতন্যময় উত্তপ্ত পদার্থ যে যখন যে বিষয় চিন্তা করা হয়, সাথে সাথে মনটাও সেখানে যেতে থাকে। ক্রমশঃ ক্রমশঃ দেহটাও মনের সাথে সাথে যেতে থাকে—ঠিক যেমন করে রাণী মৌমাছি লক্ষ লক্ষ মৌমাছিকে guide করে নেয়। মনের সাথে মনের ইচ্ছাশক্তিটাও যেতে থাকে। দেহের অণুপরমাণুগুলোও মধুকরের মত মনের ইচ্ছাশক্তির পেছনে পেছনে যেতে থাকে। এই বিশ্বের ফাঁকা জায়গায় অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুপরমাণু রয়েছে। সূর্যের আলো যখন আমাদের কাছে আসে তখন ঐসব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুপরমাণুর ভেতর দিয়েই আসে। তেমনি করে কোন বিষয়বস্তুকে যখন চিন্তা করা হয়, তখন অনেক বিষয় বস্তুর ভিতর দিয়েই সেই বস্তুকে নিয়ে আসা হয়। মনে মনে চিন্তা করে মন কোন বিষয়বস্তুকে যখন নিয়ে আসে, যে বস্তুর ভিতর দিয়ে তাকে নিয়ে আসে, সেই বিষয়বস্তুগুলিও তখন মনের সামিল হয়ে যায়। তাদের একজাতীয় মনই বলা চলে। আজকের এই মন একদিন যখন অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় খাদ্যে, জলে বা বাতাসে ছিল, তখনও সেখানে মন ছিল, চৈতন্য ছিল। তার আগে আমরা শুধু মন হয়েই ছিলাম। মনই হচ্ছে বস্তুর বস্তুত্ব। মনই হচ্ছে প্রকৃতির আদি সুর বা Energy. মনই হচ্ছে সব কিছুর স্রষ্টা, মনই বিরাট।

ফুল ফল যেমন বীজের প্রকাশ, মনটাও তেমনি অন্তর্নিহিত

শক্তির প্রকাশ। একই মনন শক্তি একবার চোখে, একবার কানে, একবার জিহ্বায় প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের শক্তি মনেরই শক্তি। প্রকাশটাই হচ্ছে মন। আমাদের নিজের প্রকাশ যেমন মন, সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-উপগ্রহের প্রকাশও তেমনি মন, একই universe-এর সবটাই মন।

মন যেমন সর্বত্র বিচরণ করছে, তেমনি মনের সাথে যুক্ত সমস্ত বিষয় বস্তুও কর্পূরের মত মিলিয়ে যাচ্ছে—আকাশে বাতাসে মিশে যাচ্ছে। সবাই যে আমিময় হয়ে যাচ্ছে। এই আমিময় হচ্ছে সেই আদি মন, যা হতে অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। মধুকর যেমন ফুল থেকে মধু আহরণে ব্যস্ত, মনের সূক্ষ্ম অনুপরমাণুগুলো তেমনি মহাকাশ হতে মহাচৈতন্যের মধু আহরণে ব্যস্ত। যে মহাচৈতন্যের চেতনার ইঙ্গিতে এই মহাজগতের সৃষ্টি হয়েছে, সেই চৈতন্যের কণাশক্তির বিষয়বস্তু হতে মধু আহরণ করে মনের অণুপরমাণুগুলি মনের মধ্যে চৈতন্যের মৌচাক তৈরী করে নেয়। সমস্ত চেতন পদার্থগুলি তখন মনোময় হয়ে যায়। চৈতন্যের মধু আহরণ করে মন তখন নির্বাণ-নির্বিকল্পে—অষ্ট সিদ্ধির শক্তিতে ক্ষমতাশীল হয়ে গতিময়ের পূর্ণশক্তির সাথে একাত্ম হয়ে এক শক্তিতে বিরাজ করে।

আপন সত্তা উপলব্ধির উন্মাদনায় যে মনের অনন্ত তৃষ্ণা তারই বহুমুখী প্রয়াস হচ্ছে মনের এই চঞ্চলতা। মন পূর্ণ বেগে ছুটে চলেছে অপূরণকে পূর্ণ করার জন্যে। এত বেশী গতিশীল বলেই মনের এই অস্থিরতা। এটা তার বিশালতারই পরিচয়। বিশাল

বলেই তো মনকে বলা হয় গুণাতীত ভাষাতীত। এই যে ভাল লাগে না, মন বসে না, বুঝি না—এই যে রোগ শোক, দুঃখ যাতনা—এগুলোই হচ্ছে বিরাট মনের খোরাক। অপূরণকে পূরণ করার এই যে চির উন্মাদনা, সেই বিরাট অভাবকে পূরণ করার জন্য এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইচ্ছা—এই যে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি বৃত্তি—এদের নিবৃত্তির মাধ্যমেই এগিয়ে যেতে হবে। সেই অভাব পূর্ণ হবে, যখন মন মহাশূন্যের গভীরতায় ডুবে যাবে। তাইতো বলা হয়েছে—"ধ্যায়েৎ শূন্যম্ অহর্নিশম্"। ইচ্ছাশক্তির যখন নিবৃত্তি হবে তখনই গর্ভে আসবে চৈতন্যের মহাশিশু। সেই শিশু যখন প্রসব হবে তখনই শুধু বুঝা যাবে সেই নিনাদের সুর কত মধুময়। তখন জানা যাবে, কি বিরাট, ক্ষমতা আমাদের মনের।

॥ দুই ॥

এই মন সবার মাঝেই রয়েছে সহজাতভাবে, কিন্তু এলোমেলাভাবে। সূর্যের আলো সর্বব্যাপ্তমান—সর্বদাই সে ব্যাপকতায় ছড়িয়ে আছে। তাকে এক করা চলে না। ভারী lense-এর মাধ্যমে সূর্যের আলোকে কেন্দ্রীভূত করা যায় ঠিকই, কিন্তু সবটা আলো কিন্তু একত্রিত হয় না। তার বাইরেও আলো বয়ে যায়। বাতাসের বেলায়ও ঠিক তাই। একটা ফুটোর মাধ্যমে কিছুটা বাতাস একটা নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে এলেও তার বাইরেও চারদিকে প্রচুর বাতাস থেকেই যায়। মনের ধর্মও ঠিক আলো বাতাসের মতই চারদিকে বিশালতার মাঝে ছড়িয়ে পড়তে চায়। তাই মনকেই বা কি করে এক জায়গায় আটক করা যাবে? Lense-এর মত দেহের কোন কোন স্পর্শকাতর (sensative) স্থানে মনকে নিবিষ্ট করে, তাকে আমাদের প্রয়োজন মত অনেক বিশিষ্ট কাজে ব্যবহায় করা যায়। সবটা মন কখনও কেন্দ্রীভূত হবে না, তবে যত বেশী কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করবে, সে তার থেকে তত বেশী কাজ পাবে। সফলতার জন্য মনের দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস একান্ত প্রয়োজন। "হওয়ার জন্যই সৃষ্টি"—এই আত্মবিশ্বাস এবং "যতক্ষণ পর্যন্ত না হচ্ছে ততক্ষণ ছাড়বো না"—এই নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়টুকু lense-এর কাজ করছে। মন চিন্তা ছাড়া থাকতে পারে না।

কর্ম ছাড়া মন নয়। কর্মই হচ্ছে মনের শক্তি প্রকাশের পথ-পদ্ধতি। মনন করতে হলেই খনন করতে হবে। খননটা কর্মের মধ্যে চলে গেল। তোমাদের সাধারণ চিন্তা সব নিম্নগামী বলেই মন সহজভাবে সেসব চিন্তা করে। চিন্তা দ্বারা শরীরের ভিতর রসের সঞ্চার হয় বলেই চিন্তা ভাল লাগে। কিন্তু উর্ধ্বগামী চিন্তা ভাল লাগে না। তাই সূর্যের চিন্তা করতে বসলে বেশীক্ষণ ভাল লাগে না। কিন্তু সূর্যের চিন্তা করতে করতে চিন্তা যখন স্বাভাবিকভাবেই উর্ধ্বগামী হবে, সূর্যের সঙ্গে যখন তোমাদের যোগাযোগ হয়ে যাবে, তখন তোমাদের মনের চিন্তার ray সূর্যের গায়ে ঠিকমত লেগে যাবে। তখনই হবে সঙ্গম অবস্থা। তখন মনের মধ্যে রসের সৃষ্টি হবে। সূর্যের চিন্তাতে তখন তোমরা আনন্দ পাবে। তোমাদের মনের ray-এর টানে সূর্যের আকৃতি তোমাদের কাছে চলে আসবে, ঠিক যেমন করে Camera-র লেন্সের টানে তার ভিতর দিয়ে মানুষের আকৃতি চলে যায় ফটোতে। এভাবে সাধন করে গেলেই তোমরা অসীম সূর্য-শক্তির সন্ধান পাবে এবং নিজেরাও অসীমশক্তির অধিকারী হবে। দুধে 'সাজা' দিলে যেমন জমাট বেঁধে দই হয়ে যায়, জল যেমন ঠাণ্ডা করলে জমাট বেঁধে বরফ হয়ে যায়, মনটাও ঠিক সেইরূপ। কোন বিষয়বস্তুকে যখন চিন্তা করা হয়, তখন ফটোর মতই সেই বস্তুর একটা Impression চলে আসে মনের পর্দায়। মনের গতি যত বেশী হবে, যত গভীর ভাবে চিন্তা করবে, ছড়িয়ে থাকা বিষয়বস্তুগুলো তত বেশী কেন্দ্রীভূত হবে। যত দ্রুত মনের

সঞ্চালন হবে, তত বেশী আলোড়ন হবে। তত বেশী বিষয়বস্তুগুলো জমাট বাঁধবে। যখন গভীরভাবে চিন্তা করবে, বিশ্বের ঘোলাটে মনের উপর তোমার চিন্তাটা যখন ঝড়ের মত গিয়ে পড়ে, তখন মনের মন্থনের ফলে সেখানে উথাল-পাতাল অবস্থা শুরু হয়ে যায়। যত বেশী দ্রুত চিন্তা করবে, বিশ্বের বস্তুগুলো তত বেশী মনে জমাট বাঁধতে শুরু করবে। আণবিক শক্তির চেয়েও মনের ক্ষমতা বেশী। তাই চিন্তা করার সাথে সাথে কোন বিষয়বস্তুকে তোমার সামনে আনতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। অশান্তি বা রোগে শোকে যেমন দেহের ওজন কমতে থাকে তেমনি মনের টানেও দেহ ক্ষয় হয়ে যায়। ধ্যান-ধারণা জপ্-তপেও দেহের ক্ষয় হতে থাকে। মনের সাথে সাথে দেহটাও সূক্ষ্মাকারে মিশে যেতে থাকে। মনের সাথে সাথে মনের will-forceটাও যেতে থাকে। যত বেশী যাবে, দেহের অণু-পরমাণুগুলোও তত বেশী সেই power-কে follow করে। যত বেশী দ্রুত গতিতে মন যাবে তত তাড়াতাড়ি রক্ত মাংসের এই দেহটাও মনের তাপে সূক্ষ্মাকারে ওর সাথে ধীরে ধীরে মিশে যায়। একদিন দেখা যাবে কিছুই নাই—দেহটাও কর্পূরের মত মিশে গেছে। পরে আবার মনের খুশীমত দেহটাও যে কোন স্থানে গিয়ে আবার নিজস্ব আকৃতি ধারণ করতে পারে। আগেই বলা হয়েছে মনটা যেখানে যাবে, দেহের অণুপরমাণুগুলোও সেখানেই যাবে।

ব্যায়াম করে যেমন দেহের মাংসপেশীকে শক্তিশালী করা হয়, তেমনি ধ্যান, ধারণা, জপ, তপ ইত্যাদি মনের চর্চ্চার

মাধ্যমে অন্তর্নিহিত মনশক্তিকে জাগাতে হবে, বাড়াতে হবে। দেহের সঞ্চালনে যেমন দেহ বলিষ্ঠ হয়, তেমনি চিন্তার ধারাতে ধারাতে মনের ক্ষমতা বাড়তে থাকে।

মনটা বিদ্যুতের ঝলকানির মত ছড়িয়ে আছে, ব্যাপ্তমান হয়ে আছে। গভীর ভাবে মনন করলে তবেই মনের মন্থনে সেই ছড়িয়ে থাকা শক্তিটা Concentrated হতে থাকে, তখন সব কিছুই মনন করার সাথে সাথে জানা যায় ও বুঝা যায়। মন যে কত বিরাট তা ভাষায় বর্ণনা করা চলে না। পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি সবাই শূন্যে অবস্থান করে সবার মন দিয়ে সবাইকে টেনে রেখেছে, তা না হলে পড়ে গিয়ে গুঁড়ো হয়ে যেত। Engine যে শক্তিতে গাড়ীকে সামনের দিকে টানছে, তুমি যদি তোমার মনন শক্তির সাহায্যে তার চেয়ে বেশী জোরে গাড়ীকে পিছন দিকে টেনে রাখ তবে গাড়ীর সাধ্য কি সে সামনে এগুবে।

মনের এই যে আলোড়ন এটা হচ্ছে গড়বার জন্যে। এ না হলে নিজেকে গড়তে পারা যায় না। গড়বার জন্যেই সাগর, বায়ু, গ্রহ, উপগ্রহ সব উথাল-পাতাল করছে। এভাবেই মেঘে মেঘে ঘর্ষণে ঘর্ষণে বিদ্যুতের সৃষ্টি হচ্ছে। বিরাট ঘর্ষণে ঘর্ষণে বিরাট শক্তির উদ্ভব। এভাবেই ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে জাগতিক যত রূপের সৃষ্টি। মনের এই যে আলোড়ন, এই যে মন্থন, এটাই হচ্ছে জাগতিক রূপের সাথে যুক্ততা। একেই বলা হয়েছে প্রকৃতি-পুরুষের মিলন। মিলনে যে আলোড়নের সৃষ্টি তাতেই বৃত্তির

নিবৃত্তির মাধ্যমে যাবতীয় সৃষ্টি। আবার এমনি করেই মনের আলোড়নের ফলেই জীব জগতের সৃষ্টি।

এই যে universal tune—সেই বিরাট সুরের যে মাত্রাতে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, সেই মাত্রা বা tempo-কে রক্ষা করার জন্যই, সেই মাত্রার সাথে এক মাত্রা করার জন্যই মনের এই আলোড়ন—এই হতাশা-নিরাশা। এইটাই হচ্ছে জ্ঞানাগ্নি। এই অগ্নিতে সবাইকেই একদিন আহুতি দিতে হবে। এটাই হচ্ছে সত্যিকারের যজ্ঞ। শূন্য ধ্যানে মগ্ন হয়ে নিজের সত্তায় ডুবে গিয়ে মনন করে খুঁজে বের করতে হবে আদি শক্তির সেই সুর ও সাড়াকে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যেভাবেই হোক মনটাকে মহাশূন্যে ফেলে দিলে খাদ্য হতে রক্ত, মাংস ও বীর্য হবার মত সিদ্ধি-মুক্তি, নির্বাণ-নির্বিকল্প যা হবার আপনি হয়ে যাবে। কিভাবে হবে তা নিয়ে ভাবতে হবে না। কেন এসেছ, কোথা থেকে কিভাবে কোন প্রয়োজনে এসেছ—এই সব জিজ্ঞাসার মাঝে যত বেশী এগিয়ে যাবে, মন তত বেশী শূন্য হবে, যত বেশী শূন্য হবে তত বেশী পূর্ণ হবে। সৃষ্টিতত্ত্বের অতলজলে ডুবরী হয়ে নেমে যাও—নিজেকে বিলিয়ে দাও। দেখবে সেই আদির সাড়া আপনি জেগে উঠবে। হতাশ-নিরাশ না হয়ে শুধু মহাকাশের মহাসুরের সাথে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করবে। সর্বদা ভাবতে হবে "আমরা শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। আমাদের মনে পাপ-পঙ্কিলতা নেই, বিঘ্ন বা অন্তরায় নেই—আছে শুধু বিরাট শক্তি ও সুরের সাড়া।" মন যে কত দ্রুতবেগে চলতে পারে, বাস্তবে তার ইঙ্গিত পাই

স্বপ্নের মাধ্যমে। এই যে স্বপ্ন, কত অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে—জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি—এটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে কি বিরাট ক্ষমতা মনের। স্বপ্নে মনের যে স্বচ্ছ ভাব থাকে, যে একাগ্রতা থাকে, জাগ্রত অবস্থায় তা আয়ত্ত করতে পারলে বাস্তব জগতেও অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়।

যোগীরা কি করেন? ছড়িয়ে থাকা মনকে কোন বিষয় বস্তুতে কেন্দ্রীভূত (concentrated) করার চেষ্টা করেন। তাপের আকারে যে মন সর্বদা দেহ হতে দেহের নির্যাস নিয়ে বেড়িয়ে যাচ্ছে তাকে আটক করে কাজে লাগান। না আটকালে মন এত অজস্রভাবে বয়ে যায় যে কারো ভাগেই বিশেষ কিছু পড়ে না। শহরে নর্দমায় যত ময়লা থেকে যে gas বের হয় তা থেকেই কেমন স্নিগ্ধ আলো হয়। তেমনি আমাদের মনের এই ক্লেদ-পঙ্কিলতা, এই যে নানা রকম রোগ শোক, দুঃখ যাতনা তাপের ন্যায় মনের ভিতর ধূ ধূ করে জ্বলছে একে যদি আটক করে রাখা যায় তবে জ্বলে উঠবে আলো। যোগীরা ঠিক তাই করছেন।

এই মন-রাজত্বের factory-তে হরেক রকম রকমের সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষের বাচ্চা, পিঁপড়ার বাচ্চা, হাতির বাচ্চা, কাকের বাচ্চা থেকে চাল, ডাল, তেল, নুন, খাদ্য—সবই মন হতেই বের হচ্ছে। আবার দেখা, শুনা, ভালবাসা, কাম, ক্রোধ সে সবও মনের সৃষ্টি, সবই কাজে লাগে। জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত কত ভাবে মন খরচ হয়ে যাচ্ছে। রাগ নিচ্ছে, হিংসা নিচ্ছে, লোভ

পাচ্ছে, কামকে দিচ্ছ। খেলতে যাও, সিনেমাতে যাও, অফিস, বাজারে সবাইকে এতটুকু করে মন দান করে যাচ্ছ। কম দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু কোন পাওনাওয়ালাই কিন্তু তেমন তেমন কিছু পেল না। মনের আয় ব্যয় সমান হয়ে গেছে। তাই বৃহৎ কোন কাজে মন লাগছে না, কোন গভীর চিন্তা মন করতে পারছে না। নদীর এপার ভাঙ্গে, ওপার গড়ে। যে যে পথে আমাদের মনটা স্বাভাবিক ভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে, এই মন দিয়েই সেই সেই কেন্দ্রস্থলের (আজ্ঞা, সহস্রার) চিন্তা করতে হবে। ব্যায়াম করলে যেমন দৈহিক্ষ শক্তি বাড়ে, তেমনি মনের ক্ষমতা বাড়াবার জন্য মনের সঞ্চালন করতে হবে। যেখান থেকে মন উদ্ভব হচ্ছে সেই আজ্ঞা ও সহস্রারের সাথে যোগা-যোগ রাখতে হবে। তবেই মনের শক্তি বাড়তে থাকবে। ভিতরকার ধ্বনির সাহায্যে সেই মনকে আজ্ঞা-সহস্রারে নিবিষ্ট করতে হবে। বাঁশী বাজিয়ে সাপুড়ে যেমন করে সাপ নাচায়, তেমনি করে মন্ত্রের শক্তিতে যার যার ভিতরকার কুলকুণ্ডলিনী সর্পকে জাগাতে হবে। যে শক্তি সাপের মত কুণ্ডল পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে, মন্ত্রধ্বনি পেলেই সে জেগে উঠবে। বাঁশীর সুরে সাপ যেমন সজাগ হয়ে উঠে, সব সময় সুর দিলে, অহর্নিশ মন্ত্র উচ্চারণ করলে, ভিতরকার সর্প তেমনি জেগে উঠবে—সুপ্তশক্তি জাগতে থাকবে।

———